দশম অধ্যায়: হঠাৎ মৃত্যু ও পুনর্জন্ম

এ পর্যন্ত আমি ধরে নিয়েছি মহাবিশ্বের পরিণতি নির্ধারিত হবে অনেক অনেক দিন পরে। হয়ত অসীম সময় পরের ভবিষ্যতে। হয়ত সেটা ঘটবে বিস্ফোরণ কিংবা আর্তনাদের (আরও সঠিক করে বললে কচকচ শব্দ বা তীব্র হিমায়ন) মাধ্যেম। মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হলে সেই আসন্ন ঘটনার বহু বিলিয়ন বছর আগেই আমাদের বংশধররা আগাম সঙ্কেত পাবে। কিন্তু আরও একটি আরও বেশি ভয়াবহ সম্ভাবনা আছে।

আমি আগেই বলেছি, মহাবিশ্বের দিকে তাকালে জ্যোতির্বিদরা মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থার তাৎক্ষণিক কোনো চিত্র দেখেন না। দূরের অঞ্চল থেকে আমাদের কাছে আলো আসতে সময় লাগে বলে আমরা একটি বস্তুর সেই অবস্থা দেখি যখন এটি থেকে আলো বের হয়েছিল। টেলিস্কোপ শুধু দূরের জিনিস দেখার যন্ত্র নয়, অতীতের জিনিস দেখারও যন্ত্র। একটি বস্তু যত দূরে হবে, এর তত অতীতের চিত্র আজ দেখব আমরা। বাস্তবতা হলো, জ্যোতির্বিদদের কাছে মহাবিশ্ব হলো স্থান ও কালের মাঝখান দিয়ে কেটে নিয়ে এক ফালি অতীত। কেতাবি নাম অতীতের আলোক কোন (cone)। ১০.১ চিত্রে এটি দেখানো হয়েছে।

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে কোনো তথ্য বা ভৌত ঘটনা আলোর চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না। অতীতের আলোক কোন আমাদের জ্ঞানকে যেমন সীমিত করছে, তেমনি সীমিত করছে বর্তমানে আমাদেরকে প্রভাবিত করতে পারা ঘটনাকেও। তার মানে যে ভৌত ঘটনা আমাদের দিকে আলোর বেগে আসছে, সেটি আসছে কোনো পূর্বসঙ্কেত ছাড়াই। বিপর্যয় যদি অতীতের লাইট কোন বেয়ে থেকে ধেয়ে আসে, তাহলে সেই বিপদ আগে থেকে বোঝাই যাবে না। আঘাতপ্রাপ্ত হবার পরেই কেবল প্রথম এর কথা জানা যাবে।

চিত্র ১০.১

স্থান ও কালের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু P চিন্তা করুন। এটা হয়ত এখন এবং এখানে। যেমন, মহাবিশ্বের দিকে তাকানো একজন জ্যোতির্বিদ আসলে দেখছেন এর অতীত অবস্থা। বর্তমান অবস্থা নয়। P বিন্দুতে আসা আলো তথ্য P এর মাধ্যমে অতীতের আলোক কোন বেয়ে আসছে, যার গতিপথ তীর্যক রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে। আলোর চেয়ে দ্রুত কোনো তথ্য বা ভৌত প্রভাব চলতে পারে না বলে এই মুহূর্তের একজন পর্যবেক্ষক শুধু ছবির গাঢ় অঞ্চলে ঘটা প্রভাব বা ঘটনা দেখতে পাবেন। অতীতের আলোক কোনের বাইরে ঘটা কোনো দূর্যোগ হয়ত পৃথিবীর দিকে বিপদসঙ্কেত পাঠাতে থাকবে। কিন্তু পর্যবেক্ষক সেটা না জেনেই আনন্দের মধ্যে সময় পার করবে।

একটি সরল কাল্পনিক উদাহরণ চিন্তা করি। এই মুহুর্ত সূর্য বিস্ফোরিত হলে আমরা সেটা জানতে পারব সাড়ে আট মিনিট পরে। সূর্য থেকে আমাদের কাছে আসতে এই সময়টুকুই লাগে। একইভাবে হতেই পারে, কাছের কোনো নক্ষত্র এর মধ্যেই সুপারনোভা হিসেবে বিস্ফোরিত হয়েছে। এটা হলে পৃথিবী প্রাণঘাতী বিকিরণে ছেয়ে যাবে। কিন্তু সেটা না জেনেই আরও কয়েক বছর আমরা আনন্দেই সময় কাটাবো। অথচ বিপর্যয়ের খবর কিন্তু আমাদের দিকে আলোর বেগেই ছুটে আসবে। ফলে, এই মুহূর্তে মহাবিশ্বকে দেখতে যথেষ্ট মনে হলেও আমরা নিশ্চিত করতে বলে দিতে পারি না ভয়ঙ্কর কিছু ইতোমধ্যেই ঘটে যায়নি।

সবচেয়ে আকস্মিক বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি ঘটনার মহাজগাতিক অঞ্চলের আশেপাশেই সীমাবদ্ধ থাকবে। নক্ষত্রের মৃত্যু বা ব্ল্যাকহোলের মধ্যে বস্তুর পতন গ্রহ ও আশেপাশের নক্ষত্রকে প্রভাবিত করবে। এর প্রভাবই হয়ত কয়েক আলোকবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় বিস্ফোরণ ঘটবে কিছু কিছু ছায়াপথের অভ্যন্তরে ঘটা ঘটনায়। আগেও বলেছি, মাঝেমাঝে আলোর বেগের বড় এক ভগ্নাংশের মধ্যে বস্তুর বিশাল বিশাল পিচকিরি নির্গত হয়। সেই সাথে বেরিয়েয় আসে বিপুল পরিমাণ বিকিরণ। এই বিশৃঙ্খলার প্রভাব পুরো ছায়াপথজুড়ে থাকে।

কিন্তু পুরো মহাবিশ্বকে কাঁপিয়ে দেওয়া ঘটনাগুলো কেমন হবে? এমন কোনো আলোড়ন কি সম্ভব যা এক ধাক্কায় পুরো মহাবিশ্বকেই এর মধ্যবয়সেই শেষ করে দেবে? এমন কি হতে পারে যে সত্যিকারের কোনো মহাজাগতিক বিপর্যয় শুরুই হয়ে গেছে? যার অশুভ প্রভাব হয়ত আমাদের অতীতের আলোক কোন বেয়ে ধেয়ে আসছে। ধ্বংস হতে যাচ্ছে আমাদের স্থানকালের ভঙ্গুর কাঠামো।

১৯৮০ সালে সিডনি কোলম্যান ও ফ্র্যাংক ডি লুসিয়া ফিজিক্যাল রিভিউ জার্নালে একটি অশুভ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। শিরোনামটা একেবারেই অক্ষতিকর। “শূন্যস্থান ক্ষয়ের মহাকর্ষীয় প্রভাব”। তাঁরা যে ভ্যাকুয়াম বা শূন্য স্থানের কথা বলছেন সেটি নিছকই ফাঁকা স্থান নয়। এটা হলো কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ফাঁকা স্থান। তৃতীয় অধ্যায়ে আমি ব্যাখ্যা করেছি, আমরা যেটাকে ফাঁকা স্থান মনে করি সেখানে আসলে প্রচুর পরিমাণ ক্ষণস্থায়ী কোয়ান্টাম কর্মকাণ্ড ঘটে চলছে। দৈব উন্মাদনায় ভূতুড়ে ভার্চুয়াল কণারা প্রতি মুহূর্তে আবির্ভূত ও উধাও হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের হয়ত মনে আছে, এই ভ্যাকুয়াম অবস্থা কিন্তু অনন্য নয়। কোয়ান্টাম অবস্থা কয়েকটি হতে পারে। যার সবগুলোই হবে ফাঁকা। কিন্তু সবগুলোর কোয়ান্টাম কর্মকাণ্ডের স্তর ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক অবস্থার শক্তিও আলাদা আলাদা।

কোয়ান্টাম ফিজিক্সের সুপ্রতিষ্ঠিত একটি নীতি হলো, উচ্চশক্তির অবস্থা নিম্নশক্তির অবস্থায় নেমে আসতে চায়। যেমন ধরুন, একটি পরমাণু অনেকগুলো উত্তেজিত অবস্থায় থাকতে পারে। যার সবগুলো অবস্থাই অস্থিতিশীল। এটি সবচেয়ে নিমশক্তির অবস্থায় বা নিম্নতলের অবস্থায় নেমে আসতে চেষ্টা করবে। একইভাবে একটু উত্তেজিত ভ্যাকুয়ামও নিম্নতম শক্তির বা “সত্যিকারের” ভ্যাকুয়ামে নেমে আসতে চেষ্টা করবে। স্ফীতিময় মহাবিশ্বে ধরে নেওয়া হয়েছে, খুব প্রারম্ভিক মহাবিশ্ব উত্তেজিত বা “ছদ্ম” ভ্যাকুয়াম অবস্থায় ছিল। এ সময় এটি চরমভাবে স্ফীত হয়ে ওঠে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই অবস্থা সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামে চলে আসে। শেষ হয় স্ফীতি।

সাধারণত মনে করা হয়, মহাবিশ্ব বর্তমানে সত্যিকারের ভ্যাকুয়াম অবস্থায় আছে। তার মানে, আমাদের সময় ফাঁকা স্থান হলো সবচেয়ে নিম্নশক্তির ভ্যাকুয়াম। কিন্তু আমরা কি নিশ্চিত করে সেটা বলতে পারি? কোলম্যান ও ডি লুসিয়া একটি ভয়ানক সম্ভাবনার কথা বলছেন। বর্তমানের ভ্যাকুয়াম হয়ত সত্যিকারে ভ্যাকুয়াম নয়। এটা হয়ত আপাতত দীর্ঘস্থায়ী কোনো নকল ভ্যাকুয়াম। যার কারণে হয়ত ভুল করে আমরা মনে করে নিয়েছি আমরা নিরাপদ আছি। কারণ এই নকল ভ্যাকুয়াম কয়েক বিলিয়ন বছর ধরে টিকে আছে। আমরা অনেক ধরনের কোয়ান্টাম অবস্থার কথা জানি। যেমন ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস, যার অর্ধায়ু বিলিয়ন বিলিয়ন বছর। একবার মনে করুন যে বর্তমানের ভ্যাকুয়ামও এই ধরনের, তাহলে? কোলম্যান ও ডি লুসিয়ার গবেষণাপত্রের শিরোনামে উল্লিখিত ভ্যাকুয়ামের ক্ষয় থেকে একটি ভয়ানক সম্ভাবনা পাওয়া যাচ্ছে। হয়ত বর্তমান ভ্যাকুয়াম হুট করে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মহাবিশ্ব চলে যেতে পারে আরও নিম্নশক্তির অবস্থায়। যার পরিণাম আমাদের জন্যে হবে ভয়ানক (এবং বাকি সবার জন্যেও)।

কোলম্যান ও ডি লুসিয়ার প্রস্তাবনার পেছনে কাজ করছে কোয়ান্টাম টানেলিং প্রক্রিয়া। একে সবচেয়ে সহজে ব্যাখ্যা করার জন্যে একটি কোয়ান্টাম কণা একটি বলের বাধায় আটকে আছে—এমন সরল চিত্র বিবেচনা করা যেতে পারে। ধরুন, ১০.২ চিত্রের মতো কণাটি একটি উপত্যকায় আটকে আছে। দুই পাশে আছে খাড়া পাহাড়। বাস্তবে পাহাড়ই হতে হবে এমন কথা নেই। যেমন, তারা বৈদ্যুতিক বা নিউক্লীয় বলের ক্ষেত্রও হতে পারে। এই পাহাড় পাড়ি দেওয়ার (বা বলক্ষেত্রকে অতিক্রম করার) শক্তি উপস্থিত না থাকলে মনে হবে কণাটি চিরকাল আটকেই থাকবে। কিন্তু মনে করুন দেখুন, কোয়ান্টাম কণারা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি মানতে বাধ্য। যার কারণে এরা অল্প সময়ের জন্যে শক্তি ধার করতে পারে। এর ফলে মজার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়। কণাটি পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার মতো শক্তি ধার করতে পারলে এবং ধার করা শক্তি ফিরিয়ে দেবার আগেই ওপাশে নেমে যেতে পারলেই তো আটকাবস্থা থেকে বেরিয়ে যেতে পারছে। বাস্তবেই এটি বাধা থেকে সুড়ঙ্গ কেটে বেরিয়ে গেল।

চিত্র ১০.২

টানেল ইফেক্ট বা সুড়ঙ্গ প্রভাব। দুই পাহাড়ের মাঝের উপত্যকায় আবদ্ধ কোয়ান্টাম কণারও শক্তি ধার করে পাহাড়ের ওপাশে চলে যাওয়ার একটি ক্ষুদ্র সম্ভাবনা আছে। বাস্তবে সুড়ঙ্গ কেটে ওপাশে চলে যাওয়া পর্যবেক্ষণে দেখাও গেছে। এর একটি পরিচিত উদাহরণ হলো, কিছু মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের আলফা কণা নিউক্লীয় বলের বাধাকে ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার নাম আলফা তেজস্ক্রিয়তা। এই উদাহরণে পাহাড় হলো নিউক্লীয় ও তড়িচ্চুম্বকীয় বল। আঁকা ছবিটা নিছকই ঘটনাটিকে সহজে বোঝানোর জন্যেই দেওয়া হয়েছে।

এমন আবদ্ধ জায়গা থেকে কোয়ান্টাম কণার সুড়ঙ্গ কেটে বেরিয়ে যাওয়া বাধার উচ্চতা ও প্রস্থের ওপর খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ভর করে। উচ্চতা যত বেশি হবে, কণাকে ওপরে ওঠার জন্যে তত বেশি শক্তি ধার করতে হবে। ফলে অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে ঋণও ফিরিয়ে দিতে হবে তত তাড়াতাড়ি। তার মানে উচ্চ বাধা পার হতে হলে বাধাকে হতে হবে চিকন। যাতে খুব দ্রুত ঋণ ফিরিয়ে দেওয়ার আগেই বাধা পার হয়ে যাওয়া যায়। এ কারণেই সুড়ঙ্গ প্রভাব নিত্যদিন চোখে পড়ে না। লক্ষ্যণীয় টানেলিং ঘটতে হলে যেমন উচ্চ ও প্রশস্ত বাধা হওয়া যাবে, বড় জগতের বাধাগুলো তার চেয়ে বেশি বড়। নীতিগতভাবে একজন মানুষ একটি ইটের দেয়াল ভেদ করে চলে যেতে পারবে। কিন্তু এ অলৌকিক কাজ করতে পারার কোয়ান্টাম সুড়ঙ্গ সম্ভাবনা অনেক অনেক অনেক ক্ষুদ্র। তবে পারমাণবিক জগতে টানেলিং অহরহ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, আলফা তেজস্ক্রিয়তা এ প্রক্রিয়াতেই ঘটে। অর্ধপরিবাহী ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতেও সুড়ঙ্গ প্রভাব কাজে লাগানো হয়। যেমন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে টানেলিংয়ের মাধ্যমে স্ক্যান করা।

বর্তমান ভ্যাকুয়ামের সম্ভাব্য ক্ষয়ের সমস্যা সম্পর্কে কোলম্যান ও ডি লুসিয়া অনুমান করছেন, ভ্যাকুয়াম তৈরি করা কোয়ান্টাম ক্ষেত্র হয়ত ১০.৩ চিত্রে দেখানো বলের মতো (রূপক) দৃশ্য তৈরি করে। বর্তমান ভ্যাকুয়াম অবস্থা আছে উপত্যকা A এর ভূমিতে। তবে সত্যিকারের ভ্যাকুয়াম আছে উপত্যকা B এর ভূমিতে, যা A এর নীচে। ভ্যাকুয়াম উচ্চ শক্তির A অবস্থা থেকে নিম্ন শক্তির B অবস্থায় নেমে আসতে চাইবে। কিন্তু মাঝখানে “পাহাড়” বা বল ক্ষেত্র থাকায় সেটি করা যাচ্ছে না। পাহাড় এ ক্ষয়কে বাধা দিলেও কোয়ান্টাম টানেলিং প্রভাবের কারণে পুরোপুরি থামিয়ে রাখছে না। A থেকে B উপত্যকায় সুড়ঙ্গ কেটে চলে আসা সম্ভব। এই তত্ত্ব সঠিক হলে মহাবিশ্ব ধার করা সময়ের মধ্যে অবস্থান করছে। আটকে আছে উপত্যকা Aতে। কিন্তু সুড়ঙ্গ দিয়ে যেকোনো সময় B উপত্যকায় চলে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা সবসময় আছে।

চিত্র ১০.৩

নকল ও সত্যিকারের ভ্যাকুয়াম অবস্থা। হতে পারে ফাঁকা স্থান A এর বর্তমান কোয়ান্টাম অবস্থা সবচেয়ে নিম্ন শক্তির অবস্থা নয়। হয়ত এটি উঁচু কোনো উপত্যকার আপাত স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা আছে এটি সুড়ঙ্গ প্রভাবের মাধ্যমে ক্ষয়ে গিয়ে সত্যিকারের স্থিতিশীল গ্রাউন্ড অবস্থা B তে নেমে আসবে। বুদ্বুদের তৈরির মাধ্যমে ঘটা এই অবস্থান্তর থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হবে।

কোলম্যান ও ডি লুসিয়া গাণিতিকভাবে ভ্যাকুয়ামের ক্ষয়ের নমুনা বানিয়েছেন। জানতে চেয়েছেন ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে ঘটে। তাঁরা দেখলেন, স্থানের একটি দৈব (random) অবস্থানে ক্ষয় শুরু হবে। এর আকৃতি হবে সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামের একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মতো। এটি অস্থিতিশীল নকল ভ্যাকুয়াম দ্বারা বেষ্টিত থাকবে। সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামের বুদ্বুদ তৈরি হওয়া মাত্রই এটি খুব দ্রুত প্রসারিত হতে থাকবে। প্রসারণের হার চলে আসবে আলোর বেগের কাছাকাছি। যা ক্রমেই নকল ভ্যাকুয়ামের বেশি অঞ্চলে ছেয়ে যাবে। তাৎক্ষ্ণিকভাবে সেই অঞ্চলগুলো সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামে পরিণত হবে। দুই অবস্থার মধ্যকার শক্তির পার্থক্য বুদ্বুবের দেয়ালে কেন্দ্রীভূত থাকবে। আর অবস্থাগুলো হয়ত হবে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত বড় বড় মানগুলোর মতো। বুদ্বুদগুলো হয়ত মহাবিশ্বময় ঘরে বেড়াবে। গতিপথের সবকিছু ধ্বংস করতে করতে।

সত্যিকারের বুদ্বুদের দেয়ালের কথা জানতে জানতে সেটা আমাদের দরজায় হানা দেবে। আমাদের জগতের কোয়ান্টাম কাঠামো হুট করে পাল্টে যাবে। আমরা তিন মিনিটের সতর্ক সঙ্কেতও পাব না। মুহূর্তের মধ্যে সব অতিপারমাণবিক কণা ও তাদের মিথষ্ক্রিয়া আমূল পাল্টে যাবে। যেমন ধরুন, প্রোটন হয়ত সাথে সাথে ক্ষয় হয়ে যাবে। এটা ঘটলে আকস্মিকভাবে সব বস্তু বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। যা কিছু বাকি থাকবে, সেটা চলে যাবে সত্যিকারের ভ্যাকুয়ামের বুদ্বুদের অভ্যন্তরে। আমরা বর্তমানে যেমন দেখছি, সেটা হবে তার থেকে খুবই ভিন্ন। মহাকর্ষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন চোখে পড়বে। কোলম্যান ও ড লুসিয়া দেখেছেন, সত্যিকার ভ্যাকুয়ামের শক্তি ও চাপ এত তীব্র মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র তৈরি করবে যে বুদ্বুদ প্রসারিত হতে হতে বুদ্বুদ দিয়ে ঘেরা অঞ্চল ভেঙে পড়বে। এতে সময় লাগবে এক মাইক্রোসেকেন্ডেরও কম। এক্ষেত্রে মহাসঙ্কোচনের দিয়ে অগ্রযাত্রা কোমল হবে না। বরং হুট করে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। বুদ্বুদের ভেতরটা স্থানকালের সিঙ্গুলারিটিতে গিয়ে গুটিয়ে যাবে। এক কথায় তাৎক্ষণিক এক সঙ্কোচন ঘটবে। জোর দিয়ে কিন্তু সংযতভাবে তাঁরা বলছেন, এটা হতাশাজনক। তাঁরা আরও বলছেন,

আমাদের নকল ভ্যাকুয়ামে বাস করার সম্ভাবনাকে কখনোই আননদচিত্তে গবেষণা করার বিষয় মনে হয়নি। ভ্যাকুয়ামের ক্ষয় পরিবেশের চূড়ান্ত বিপর্যয়। ভ্যাকুয়াম ক্ষয়ের পরে আমাদের চেনাজানা প্রাণের অস্তিত্বই শুধু অসম্ভব নয়, এর গাঠনিক উপাদানও অসম্ভব। তবে সান্ত্বনার একটি জায়গা আছে। সম্ভবত সময়ের সাথে সাথে নতুন ভ্যাকুয়াম স্থিতিশীল হবে। আমাদের চেনাজানা প্রাণের অস্তিত্ব না থাকলে এমন কিছু কাঠামো হয়ত থাকবে যারা আনন্দ উপভোগ করতে জানবে। এ সম্ভাবনাও এখন আর নেই।

কোলম্যান ও ডি লুসিয়ার গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলে পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদরা ভ্যাকুয়াম ক্ষয়ের ভয়ানক ফলাফল নিয়ে ব্যাপক আলোচনায় লিপ হন। নেচার জার্নালে এর একটি ফলো-আপ প্রকাশিত হয়। এটা লেখেন কসমোলজিস্ট মাইকেল টার্নার ও পদার্থবিদ ফ্র্যাংক উইলচযেক। তাঁরা একটি ভয়ানক ফলাফল বের করেন, “ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনসের আচরণ থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের ভ্যাকুয়ামকে বাস্তবে স্থিতিশীল মনে হলেও এটি না নয়। কোনো আগাম সঙ্কেত ছাড়াই মহাবিশ্বের কোথাও সত্যিকার ভ্যাকুয়ামের একটি বুদ্বুদ তৈরি হয়ে যেতে পারে। বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে আলোর গতিতে।”

টার্নার ও উইলচযেকের প্রকাশনার পরপরই পিট হাট ও মার্টিন রিজ নেচারেই আরেকটি আতঙ্কের কথা প্রকাশ করেন। মহাবিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়ার মতো ভ্যাকুয়াম বুদ্বুদ হয়ত কণাপদার্থবিদরাই মনের অজান্তে তৈরি করে ফেলতে পারেন। ভয়টা হচ্ছে, অতিপারমাণবিক কোণাদের খুব উচ্চ শক্তির সংঘর্ষে হয়ত এমন অবস্থা তৈরি হবে যাতে ভ্যাকুয়াম ক্ষয় হয়ে যেতে চাইবে। হয়ত সেটা অল্প সময়ের জন্যে ছোট্ট জায়গায়ই হবে। আণুবীক্ষণিক জগতেও একবার এই অবস্থান্তর ঘটলে নবসৃষ্ট এই বুদ্বুদকে থামানো যাবে না। খুদ দ্রুত এটি ছড়িয়ে বড় হয়ে যাবে। তাহলে করে পরের প্রজন্মের কণাত্বরকযন্ত্রগুলো কি নিষিদ্ধ করা উচিত? হাট ও রিজ অবশ্য আশ্বস্ত করছেন। তাঁরা বলছেন, মহাজাগতিক রশ্মিগুলোতে শক্তি আমাদের কণাত্বরকযন্ত্রগুলোর চেয়ে বেশি হয়। আর মহাজাগতিক রশ্মিগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করে চলেছে। কিন্তু ভ্যাকুয়াম ক্ষয় তো তাতে শুরু হয়নি। তবে ত্বরকযন্ত্রের শক্তি কয়েক শ গুণ বাড়াতে পারলেই এত দিন মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীকে যে শক্তিতে আঘাত করেছে তার চেয়ে বেশি তেজস্বী সংঘর্ষ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। তবে পৃথিবীতে বুদ্বুদ তৈরি হতে পারে কি না সেটা আসল বিষয় নয়। বিগ ব্যাংয়ের পরের কোনো এক সময়ে এই ঘটনা পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের কোথাও ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে কি না সেটাই হলো আসল কথা। হাট ও রিজ বলেছেন, দুটি মহাজাগতিক রশ্মির মুখোমুখি ধাক্কার লাগার সম্ভাবনা খুব কম। যাদের শক্তি বর্তমান ত্বরকযন্ত্রের চেয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন গুণ বেশি। অতএব, ত্বরকযন্ত্রের লাগাম টেনে ধরার এখনই কোনো দরকার নেই।

অন্য দিকে আবার যে বুদ্বুদের তৈরির কারণে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব হুমকির মুখে, সেই বুদ্বুদই একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মহাবিশ্বের অধিবাসীদের মুক্তির একমাত্র উপায় হতে পারে। মহাবিশ্বের মৃত্যু থেকে বাঁচার একটি নিশ্চিত উপায় হলো আরেকটি মহাবিশ্ব তৈরি করে সেখানে পালিয়ে যাওয়া। এটা হয়ত কল্পনার ঘোড়ায় সবচেয়ে লম্বা লাগাম। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে “শিশু মহাবিশ্ব” নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে। আর এদের অস্তিত্বের আলোচনা একেবারেই ছেলেমানুষি নয়।

১৯৮১ সালে বিষয়টি প্রথম আলোচনায় আনেন জাপানের একদল পদার্থবিদ। তাঁরা সত্যিকার ভ্যাকুয়াম দিয়ে বেষ্টিত একটি নকল ভ্যাকুয়ামের ছোট বুদ্বুদের আচরণের একটি সরল গাণিতিক নিয়ে বিশ্লেষণ চালান। এটা হলো একটু আগে বলা অবস্থার বিপরীত পরিস্থিতি। তাঁদের পূর্বাভাস বলছে, নকল ভ্যাকুয়াম তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়ে স্ফীত হবে। একটি বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে এটি প্রসারিত হয়ে বড় একটি মহাবিশ্বে রূপ লাভ করবে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, নকল ভ্যাকুয়ামের বুদ্বুদের স্ফীতির কারণে বুদ্বুদের দেয়াল এত প্রসারিত হবে যে নকল ভ্যাকুয়ামের অঞ্চল বড় হয়ে সত্যিকার ভ্যাকুয়ামের অঞ্চলকেও দখল করবে। কিন্তু এতে করে প্রত্যাশিত আচরণের উল্টো ঘটনা ঘটে। নিম্ন শক্তির সত্যিকার ভ্যাকুয়ামই তো উচ্চ শক্তির নকল ভ্যাকুয়ামকে সরিয়ে দেওয়ার কথা। উল্টোটা তো হওয়ার কথা নয়।

আজব ব্যাপার হলো, সত্যিকার ভ্যাকুয়াম থেকে দেখলে নকল ভ্যাকুয়ামের বুদ্বুদের দখল করা অঞ্চলকে দেখে স্ফীত হচ্ছে বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে এটাকে বরং দেখতে ব্ল্যাকহোলের মতো মনে হয়। (এক্ষেত্রে একে ডক্টর হু এর টাইম মেশিনের টারডিসের মতো লাগে। যাকে বাইরে চেয়ে ভেতরে থেকে দেখলে বড় দেখায়) নকল ভ্যাকুয়াম বুদ্বুদের ভেতরে অবস্থান করা একজন কাল্পনিক পর্যবেক্ষক মহাবিশ্বকে ব্যাপকভাবে স্ফীত হতে দেখবে। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে একে খুব সঙ্কুচিত মনে হবে।

এই অদ্ভুত অবস্থাটু বুঝতে হলে একটি উদাহরণ কাজে লাগতে পারে। ধরুন, একটি রাবারের চাদর একটি জায়গায় ফুলে ওঠে বেলুনের মতো ছড়িয়ে গেল (১০.৪ চিত্র দেখুন)। এই বেলুন এক ধরনের শিশু মহাবিশ্ব তৈরি করবে। একটি সংযোজক সুতা বা ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে এটি মূল মহাবিশ্বের সাথে যুক্ত থাকবে। মূল মহাবিশ্ব থেকে ওয়ার্মহোলের গলাকে ব্ল্যাকহোলের মতো মনে হবে। এই গঠনটা খুব অস্থিতিশীল। হকিং প্রভাবের মাধ্যমে ব্ল্যাকহোলটি খুব দরিত মিলিয়ে যায়। মূল মহাবিশ্ব থেকেও খুব দ্রুত পুরোপুরি হারিয়ে যায়। ফলে ওয়ার্মহোলটি আলাদা হয়ে যায়। আর শিশু মহাবিশ্ব মূল মহাবিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে নিজেই হয়ে যায় নতুন ও এক স্বতন্ত্র মহাবিশ্ব। মূল মহাবিশ্ব থেকে কুঁড়ির জন্মের মাধ্যমে এই শিশু মহাবিশ্বের তৈরির মতো করেই আমাদের মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে বলে অনুমান করাও যেতেও পারে। হয়ত অল্প সময়ের জন্যে স্ফীতির পরে স্বাভাবিকভাবে প্রসারণ কমে এসেছিল। এই নমুনা স্পষ্ট করেই বলছে, আমাদের মহাবিশ্বও হয়ত এভাবেই এসেছে। এসেছে হয়ত অন্য কোনো মহাবিশ্বের সন্তান হিসেবে।

স্ফীতি তত্ত্বের জনক অ্যালান গুথ ও তাঁর সহকর্মীরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, উপরে বর্ণিত চিত্র দারুণ একটি সম্ভাবনা পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষাগারেই হয়ত একটি মহাবিশ্ব বানানো যাবে। নকল ভ্যাকুয়াম ক্ষয়ে গিয়ে সত্যিকার ভ্যাকুয়ামের বুদ্বুদে পরিণত হওয়ার মতো আতঙ্কের ব্যাপার নয় এটি। সত্যিকার ভ্যাকুয়াম দিয়ে বেষ্টিত নকল ভ্যাকুয়ামের বুদ্বুদ তৈরির ঘটনা মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে না। হ্যাঁ, পরীক্ষা চালাতে একটি বিগ ব্যাংয়ের সূচনা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর বিস্ফোরণ ক্ষুদ্র একটি ব্ল্যাকহোলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর ব্ল্যাকহোলটি খুব দ্রুতই মিলিয়ে যাবে। নতুন মহাবিশ্ব নিজেই নিজের জায়গা বানিয়ে নেবে। আমাদের কোনো স্থান কেড়ে নেবে না।

চিত্র ১০.৪

মূল মহাবিশ্ব থেকে বেলুনের মতো ছড়িয়ে গিয়ে একটি শিশু মহাবিশ্বর জন্ম। মূল মহাবিশ্বের সাথে একটি সংযোজক সুতার সাহায্যে যুক্ত থাকে। মূল মহাবিশ্ব থেকে তাকালে ওয়ার্মহোলের মুখকে ব্ল্যাকহোল মনে হবে। ব্ল্যাকহোল মিলিয়ে গেলে ওয়ার্মহোলের গলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে সম্পূর্ণ নতুন একটি স্বতন্ত্র মহাবিশ্ব জন্মলাভ করে।

হ্যাঁ, এই ভাবনাটি অনেকখানি অনুমাননির্ভর। এটি পুরোপুরি গাণিতিক তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তবে কিছু কিছু গবেষণা বলছে, এই প্রক্রিয়ায় নতুন মহাবিশ্ব জন্মলাভ করতেও পারে। খুব যত্নের সাথে বিপুল পরিমাণ শক্তিকে ঘনীভূত করে রচিত হতে পারে মহাবিশ্ব। খুব দূরের ভবিষ্যতে আমাদের নিজস্ব মহাবিশ্ব বাসের অযোগ্য হয়ে গেলে বা মহাধ্বসের সম্মুখীন হলে আমাদের বংশধররা চিরতরে এখান থেকে চলে যেতে পারে। কুঁড়ি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন মহাবিশ্ব রচনা করে সংযোজক ওয়ার্মহোল দিয়ে সেই মহাবিশ্বে যেতে হবে। সেটাই হয়ত হবে চূড়ান্ত পরিযান। অবশ্য কেউই ঠিক বলতে পারবেন না কীভাবে অকুতোভয় প্রাণীরা এই কাজটি করবে। বা আদৌ পারবে কি না। কম করে বললেও এই ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে যাত্রাটা হবে মোটেও আরামদায়ক হবে না। যদি না যে ব্ল্যাকহোলে তারা ঢুকবে সেটি খুব বড় হয়।

এসব বাস্তব বিষয়গুলো বাদ দিলে শিশু মহাবিশ্বের ধারণা কিন্তু সত্যিকারের অম্বরত্বের পথ খুলে দিচ্ছে। শুধু আমাদের বংশধরদের জন্যেই নয়, মহাবিশ্বের জন্যেও। মহাবিশ্বের জন্ম-মৃত্যুর কথা চিন্তা করার বদলে আমাদেরকে এক গুচ্ছ মহাবিশ্ব নিয়ে ভাবতে হবে। চিরকাল যার সংখ্যা শুধু বাড়বে। প্রতিটি থেকে জন্ম হবে নতুন প্রজন্মের আরও অনেক অনেক মহাবিশ্ব। হয়ত অসংখ্য। মহাজাগতিক এই উর্বরতার ফলে এই মহাবিশ্বগুলোর সমাবেশ—যাকে বলা উচিত মেটাভার্স—এর কোনো শুস্রু বা শেষ থাকবে না। প্রতিটি মহাবিশ্বেরই জন্ম থাকবে। বিবর্তন থাকবে। মৃত্যু থাকবে। আগের অধ্যায়গুলোতে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে।কিন্তু সার্বিকভাবে তাদের গুচ্ছ টিকে থাকবে চিরকাল।

এই চিত্র থেকে একটি প্রশ্ন তৈরি হয়: আমাদের মহাবিশ্ব কি প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা (স্বাভাবিকভাবে শিশুর জন্মের মতো) নাকি কোনো ইচ্ছার বাস্তবায়ন (টেস্টটিউব শিশুর মতো)? আমরা কল্পনা করতে পারি, মূল মহাবিশ্বের একটি যথেষ্ট উন্নত ও পরোপকারী জাতি হয়ত একটি শিশু মহাবিশ্ব তৈরির সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সেটা নিজেদের টিকে থাকা নিশ্চিত করতে পালানোর ব্যবস্থা করতে নয়। বরং নিজদের মহাবিশ্ব শেষ হয়ে গেলেও অন্য জায়গায় প্রাণের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে। এটা হলে শিশু মহাবিশ্বে যাওয়ার জন্যে অতিক্রমযোগ্য ওয়ার্মহোল তৈরি করতে গেলে চে কোস্ট হবে তার আর কোনো দরকার হবে না।

শিশু মহাবিশ্ব মূল মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে তা বলা যাচ্ছে না। প্রকৃতির বিভিন্ন বল ও বস্তুকণার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও জানেন না। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হয়ত প্রকৃতির সূত্রের অংশ হতে পারে। যেগুলো হয়ত সবসময় সব মহাবিশ্বের জন্যে কাজ করবে। অন্য দিকে কিছু বৈশিষ্ট্য আবার বিবর্তনের ফলেও তৈরি হতে পারে। যেমন ধরুন, বেশ কয়েকটি সত্যিকার ভ্যাকুয়াম অবস্থার অস্তিত্ব থাকতে পারে। যার সবগুলোর শক্তি একই রকম বা প্রায় একই রকম। স্ফীতি যুগের শেষে নকল ভ্যাকুয়াম ক্ষয় হলে হয়তোবা এটি অনেকগুলো সম্ভাব্য ভ্যাকুয়াম অবস্থার একটি দৈবভাবে বেছে নেয়। মহাবিশ্বের পদার্থবিদ্যার সূত্রের কথা বলতে হলে বলতে হয়, কণা ও তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের অনেক বৈশিষ্ট্যই নির্দিষ্ট ধরনের ভ্যাকুয়াম অবস্থাই ঠিক করে দেয়। একইভাবে নির্দিষ্ট করে স্থানের মাত্রার সংখ্যাও। ফলে শিশু মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য মূল মহাবিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। হয়ত এগুলোর অল্প কয়েকটিতেই শুধু প্রাণের উদ্ভব ঘটা সম্ভব হবে। যেখানে পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো আমাদের মহাবিশ্বের মতো বা কাছাকাছি হবে। অথবা হয়ত গুণাবলীর ধারাবাহিকতা রক্ষার কোনো নীতি আছে, যার মাধ্যমে অদ্ভুত মিউটেশন ব্যতীত মূল মহাবিশ্বের বাকি বৈশিষ্ট্যগুলো শিশু মহাবিশ্বে ভালোভাবে সঞ্চারিত হওয়া নিশ্চিত হয়। পদার্থবিদ লি স্মোলিন বলেছেনে, মহাবিশ্বগুলোর মধ্যে হয়ত এক ধরনের ডারউইনীয় বিবর্তন কাজ করে থাকতে পারে। যা পরোক্ষভাবে প্রাণ ও সচেতনতার আবির্ভাবের সমর্থন দেয়। এর চেয়ে মজার একটি সম্ভাবনাও আছে। মহাবিশ্বগুলো হয়ত মূল মহাবিশ্বের কোনো বুদ্ধিমান সত্ত্বার ইচ্ছার প্রতিফলন। এগুলোতে হয়ত পরিকল্পনা করেই প্রাণ ও সচেতনতার বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ভাবনাগুলো খামখেয়ালী অনুমান মাত্র। কিন্তু কসমোলজি শাখাটিই তো খুব নতুন একটি বিজ্ঞান। তবুও আগের অধ্যায়গুলোতে যে আবছা পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, এই কল্পনাপ্রবণ কথাগুলো তার কিছুটা হলেও অন্তত পরিষ্কার করবে।এগুলো থেকে বলা যায়, একদিন আমাদের বংশধররা শেষ তিনি মিনিটের মুখোমুখি হলেও কোথাও না কোথাও হয়ত সচেতন প্রাণীদের অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে।